OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 236 - 243
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শর্মিলা বাগচীর ‘অনন্তপুণ্য অতীশ দীপঙ্কর’ : এক বাঙালি ভিক্ষুর মহানির্বাণ যাত্রার গাঁথা

কৃষাণ নমঃ
অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়
কৈলাশহর, ঊনকোটি, ত্রিপুরা
Email ID : krishannamo1234@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Novel, Historical Novel, Atish Dipankar, Pala Samrat Dharmapala, Nalanda Buddhist Vihara, Vikramsila Buddhist Vihara, 1040 AD.

Abstract
In this research article, Sharmila Bagchi's novel 'Anantapunya Atish Dipankar' has been analyzed based on the theory about the characteristics of the historical novel. Sharmila Bagchi had two special reasons for writing this historical novel. In the novel, he has depicted only a part of the prominent Bengali Buddhist monk's divine life. Although it is a historical novel, the novelist effectively displays the long journey of Atish Dipankar, embedding the past-present-future in the narrative. It is not exclusively a journey from one Buddhist Vihara to another rather, it is also a journey of Mahanirvana and the external liberation. The novel gained popularity because of its unique narrative technique that blends various elements, such as internal monologue, descriptive passages, historical storytelling, and philosophical reflections, to create a rich tapestry that reflects the life and spiritual journey of the Buddhist monk Atish Dipankar.

Discussion

উপন্যাস আধুনিক জীবনের গদ্যকাব্য। এক তীব্র জীবনমুখিতা ও বাস্তব ঘনিষ্ঠতা এর উপজীব্য বলেই আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব ঘটা সম্ভব ছিল না। বাংলা উপন্যাসের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তার উৎসমুখ নির্দেশ করলেও, আমরা মোটামুটি ভাবে নিঃসন্দিগ্ধ যে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা জাগ্রত হবার আগে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। মানুষের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ এবং সেই জীবনকে সাহিত্যের বিষয় হিসাবে দেখবার আগ্রহ-এক কথায় বলা যায় মানুষের জীবনের গল্প শুনবার উৎসাহ থেকেই উপন্যাসের জন্ম। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাসকে বলা হয়েছে ‘Truth teller’, বলা হয়েছে ‘Narative realism’, স্যামুয়েল রিচার্ডসনের রচনার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

> “A Faithfull and chaste copy of real life and manners.”[১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশ্বজগতের সীমাহীন বিচিত্র জীবন লীলা, মানব জীবনের বহুমুখী গতিপ্রকৃতির যথাসম্ভব সমগ্র ও শিল্প সমন্বিত রূপ চিত্রিত করাই উপন্যাসের লক্ষ্য। ছোটগল্পের পরিসর যেখানে সংক্ষিপ্ত, নাটক যেখানে মন্ত্র প্রযোজনা ও অভিনয় দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, উপন্যাসে সেখানে রয়েছে বিস্তৃত নেগেটিভ এর পরিসর; তাঁর শিল্পের সংসারে তাঁর একচ্ছত্র স্বাধীনতা। E. M. Forster তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Aspects of the Novel - এ উপন্যাসকে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের গদ্য-কাহিনি বলে উল্লেখ করেছেন -

> "A fiction in prose of a certain extent."[২]

র‍্যালফ ফক্স-এর অভিমত -

> "The novel is not merely fictional prose, it is tine prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression."[৩]

উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব, তবুও অনেকেই উপন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি উপন্যাসের সূচনা পর্বের অন্যতম কীর্তি লেখক হেনরি ফিল্ডিং তার 'Tom Jones' উপন্যাসে যে স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন তার মধ্যে উপন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের অসারতার ইঙ্গিত রয়েছে -

> "As I am in reality, the founder of a new province of writing, so I am at liberty to make what laws I please therein."[৪]

উপন্যাসে লেখক যখন গল্প বলেন তখন প্রায়শই তিনি বর্তমান থেকে চলে যান অতীতে, অতীত থেকে ফিরে আসেন বর্তমানে; কখনো আবার বর্তমান থেকে তাঁর মানস যাত্রা ভবিষ্যতে। অর্থাৎ ঘটনা সমূহের স্বাভাবিক কালানুক্রমে সেগুলি লেখকের কারিনী কথনে উপস্থিত হয় না। সময়ের স্তরান্তর একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে আসা-যাওয়ার পরিচিত ও প্রথাসম্মত ব্যবস্থা হল 'Flash back Flash forward' এর বিশ্ব রীতি।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ইতিহাসের কাহিনী ও চরিত্রকে আশ্রয় করে তার অতীতচারী কল্পনায় উপন্যাসিক রচনা করেন ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিয়ে সুক্ষ বিচার করতে হলে অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ঐতিহাসিক সত্য ও কাব্যিক সত্যের প্রভেদ গুলিকে মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে এটি প্রাথমিকভাবে উপন্যাস- 'ঐতিহাসিক' তার বিশেষণ মাত্র। সুতরাং প্রথমে তাকে উপন্যাস হতেই হবে এবং উপন্যাস হতে গেলে তাকে এমন মানবিক অনুভূতির গল্প শোনাতেই হবে যা আধুনিক মানুষকে আকর্ষণ করে, যার মধ্যে তথ্য নয়, হৃদয়ের আকুলতাই প্রধান।

ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। তথ্য বিশেষ বা তথ্য সত্যকে প্রকাশ করাই ইতিহাসের লক্ষ্য। অন্যপক্ষে কাব্য তথা সাহিত্য তথ্যকে নিষিদ্ধ করে কল্পনায়। ইতিহাস 'বিশেষ' (particular) কে গ্রহণ ও ব্যক্ত করে; সাহিত্য 'বিশেষ'কে দেয় 'নির্বিশেষ' বা 'সামান্য' (Universal) সত্যের মর্যাদা। অ্যারিস্টটল এই কারণে 'কাব্য' বা 'সাহিত্যকে' ইতিহাসের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই পার্থক্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে উপন্যাসে ইতিহাসের নিছক যান্ত্রিক ও তথ্য নির্ভর কাহিনী ও চরিত্রের বিবরণ বাঞ্ছনীয় নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাই ইতিহাসের তথ্যসত্যকে জারিত হতে হবে সৃজনী কল্পনার প্রাণরসে। এইভাবেই শর্মিলা বাগচী তার 'অনন্তপুণ্য অতীশ দীপঙ্কর' উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য এবং সত্য ঘটনাগুলিকে কল্পনার জারক রসে জারিত করে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাস রচনার পেছনে প্রধান দুটি কারণের উল্লেখ করেছেন। তার একটি কারণ হল দীর্ঘ অন্ধকার ভেদ করে বিস্মৃতপ্রায় বিক্রমশিলা মহাবিহার এর পরিচয় জনসমক্ষে উন্মোচিত করা। এবং ওপর কারণটি হল বাঙালি রূপে বোধিপ্রভু অতীশ দীপঙ্করের সত্যপরিচয় উদঘাটিত করা।

উপন্যাসিক এই উপন্যাসে বোধিপ্রভু মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর ও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া মহাবিহার বিক্রমশীলার পারস্পরিক সম্পর্ক, পালরাজ ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত এই বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রের অপার মহিমাকে উদ্ঘাটন এবং এই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহাবিহার থেকে তিব্বতের উদ্দেশে অতীশ দীপঙ্করের চিরনিষ্ক্রমণের অকথিত কাহিনীকে সুনিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন। অতীশ দীপঙ্কর চিরকালীন বাঙালি ছিলেন। তাঁর এই পরিচয় বেশ কিছুদিন যাবৎ উপেক্ষা করে তাকে অঙ্গ প্রদেশের বর্তমান ভাগলপুর সন্নিকটস্থ সাবোর বা সত্তরের অধিবাসী বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ হল এই উপন্যাস। এই উপন্যাসে তৎকালীন বিহারের জনপদ, অধিবাসী এবং পারিপার্শ্বিক সবকিছুর সাথে শ্রী অতীশ দীপঙ্করের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই সময়ের মানুষজনের আত্মজীবন তার আনন্দ, বেদনা, চাওয়া-পাওয়াকে প্রতিবিম্বিত করা হয়েছে। উপন্যাসের সঙ্গে জীবন কথার এইখানেই পার্থক্য।

বঙ্গের পাল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ধর্মপাল, যার শাসনকাল আনুমানিক ৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন রাজন ধর্মপালের অপর নাম ছিল বিক্রমশীল। বিস্মৃতপ্রায় এই মহাবিহারের পরিচয় ও সেখানে আগত এক কর্মবীর সন্ন্যাসীর জীবনালেখ্য প্রকাশ করাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বিক্রমশীলা মহাবিহার থেকেই তার মহানিষ্ক্রমণ ঘটেছিল তিব্বতের উদ্দেশ্যে।

উপন্যাসের শুরুতেই আছে নালন্দা মহাবিহারের বর্ণনা। স্থানীয় ভাষায় 'নাল' শব্দের অর্থ 'পদ্ম'। যেখানে বিহার নির্মাণ এর পূর্বে অনেক সরোবর ছিল। বোধিপ্রভ অতীশ দীপঙ্কর নালন্দা বিহার থেকে চলেছেন ওদন্তপুরী বিহারে। এই মহাবিহারের দ্বারপ্রান্তে অধ্যক্ষ অতীশকে আর দেখা যাবে না। কারণ তিনি বৃহৎ সংসারের দায়-দায়িত্ব যথাবিহিত পূরণ হচ্ছে কিনা তা দেখতে ব্যস্ত। বুদ্ধের শিক্ষা তো কর্মবিমুখতাকে প্রশ্রয় দেয় না, তবুও নালন্দার আচার্যদেব এর অনুরোধে অতীশ আরো একদিন নালন্দা থেকে যান, সেখানে দুই দল বিদ্যার্থীদের মধ্যে দুইদিন ধরে এক অশান্তি চলছিল, এর মূল কারণ ছিল 'ত্রিপিটক' নিয়ে। একজন ছাত্র আচার্য তিষ্যকে প্রশ্ন করেছিল- 'নারীরা কেন মার্গফল লাভের যোগ্য নন?' এই কলহের মীমাংসা করার জন্যই অতীশ সেখানে রয়ে গেলেন। অতীশ স্বয়ং তর্কের মীমাংসা নিয়ে কৌতূহলী। এই নালন্দা বিহারেই তাঁর জ্ঞান লাভের প্রথম নির্দেশক গুরু জেতারির নির্দেশে তিনি আচার্য বৌদি ভদ্রের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সরহপাদ এই শিক্ষা বিহারেরই ছাত্র ছিলেন। অতীতের স্মৃতিতে ভেসে আসে অবধূত এর বাণী -

"এ জগ জল বিম্ব কারে সহজে
অমিআ আচ্ছন্তে বিস গিলেসিরে সুণ অপনা চিঅ।"[৫]

সুবর্ণদ্বীপ থেকে শিক্ষা লাভ করে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন কালে অতীশের বয়স ছিল তেতাল্লিশ। তারপর তিনি যান বুদ্ধগয়ার বজ্রাসনে। আজ এই মানুষটি নালন্দা পরিক্রমা শেষ করে চলেছেন বিক্রমশীলার পথে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি একসময় উপস্থিত হন ওদন্তপুরী বিহারে। ওদন্তপুরী বিহার এর বর্তমান অবস্থান ছিল বিহারের 'বিহার শরীফে' যা পরবর্তীকালে নালন্দার মতোই বক্তিয়ার খলজি কর্তৃক ধ্বংস হয়। অতীশকে সানন্দে স্বাগত জানান আচার্য ধর্মকীর্তি। এই ওদন্তপুরী বিহারে অতীশ একদিন এসেছিলেন ছাত্র হিসেবে। অতীশের হঠাৎ মনে হয় এই অঞ্চলে জলের প্রচণ্ড অভাব। আশি হাত মাটি খুরলে তবে জলের দেখা পাওয়া যায়। এই বিহারের আচার্য গুরু ধর্মরক্ষিতের কাছেই অতীশ 'মহাবিভাসাশাস্ত্র' অধ্যয়ন করেছিলেন।এই গুরুই তাকে 'ত্রিপিটক' শাস্ত্র অভিধর্ম বিভাষার অন্তরঙ্গ বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। মহাবিহার রূপে নালন্দা সকলের কাছেই সর্বোত্তম। কিন্তু নালন্দার পর দ্বিতীয় বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্থান হল ওদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার। নালন্দার মতো এখানকার পুস্তকাগার অনেক রাত অবধি খোলা থাকতো। পরদিন ভোরেই তিনি ওদন্তপুরী বিহার থেকে বেরিয়ে পড়েন, আচার্য কাত্যায়ন দীপঙ্করকে আরো একদিন থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অতীশ রাজি হলেন না তিনি মনে মনে উত্তর দিলেন -

> "হে ভিক্ষু অদীনপুণ্যের ইচ্ছায় সত্যই আমি বহু ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী, প্রাকার প্রাচীর, পর্বত ও আকাশ মার্গে গমন করতে পারি, মাটি থেকে ঊর্ধ্বে অনায়াসে উঠতে পারি, জলের উপরেও আমার স্বচ্ছন্দ গমন। মহাশক্তি ধারক চন্দ্র সূর্যকে স্বহস্তে স্পর্শ করতে পারি, এবং ব্রহ্মালোক পর্যন্ত গতায়ত্যে অভ্যস্ত। তবুও মনে করি আমার কর্ম এখনও ফুরায়ানি। এক অজানা অচেনা দেশ আমায় ডাকছে। আমাকে তাদের প্রয়োজন। বিক্রমশীলা একমাত্র বিক্রমশীলা সেই

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> একমাত্র বিহার যে পারে এর প্রকৃত উত্তর দিতে তবে তার জন্য মনের মধ্যে মহান তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন।"[৬]

অতীশ জল পথে যাত্রা শুরু করেন। তিনি নৌকায় রয়েছেন এবং সাথে আছেন বেশ কিছু ক্রীতদাস। অতীশ এই বাণিজ্য তরীতে আশ্রয় পেয়েছেন মগধের বণিক অশ্বনাগের কৃপায়। তরীর ক্রীতদাসরা অতীশ এর দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু কেউ কথা বলছেন না। রাতের প্রথম প্রহর কখন অতিক্রান্ত করেছেন অতীশ বুঝতে পারেন না। সমগ্র তরণী তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ আগেই অশ্বনাগ বণিকের কক্ষে নর্তক নর্তকীদের সংগীত লহরি চলছিল। মাঝিদের কথায় তিনি বুঝতে পারেন তরণী কিল্লুল সঙ্গমে উপনীত হয়েছে। অতিশ তরণীর এককোণে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান গঙ্গা নদীতে অনুচ্চ পর্বতের উপর একটি দেবালয় বর্তমান। অতীশ একটি লোককে প্রশ্ন করেন 'এ মন্দির কার কীর্তি?' উত্তরে জনৈক লোক বলেন-

> "এখানে একে সবাই জাহ্নবী বলে। ঐ যে পাহাড় টা দেখছো ওখানে ছিল জহ্নু মুনির আশ্রম। না কি যেন নাম ছিল লোকটার, যে স্বর্গ থেকে নিয়ে আসছিল মাকে, তখন ঋষি বসেছিলেন ধ্যানে। তা বেটি করলে কি জ্ঞান গম্যি হারিয়ে দিলে দিকবিদিক ভাসিয়ে। জলের ঝাপটা শরীরে লাগাতে ধ্যান গেল ভেঙে। ভেসে যান আর কি। এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে উঠে পড়লেন। আর অঞ্জলি বেঁধে চোঁ চোঁ করে সব জল পান করে নিলেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভগীরথের তো মাথায় হাত। সে সটান জহ্নুমুনির পায়ে পড়ল। অনেক বুঝিয়ে তাকে ঠান্ডাও করল। তখন জহ্নু তার জানু চিরে গঙ্গা কে মুক্তি দিলেন।"[৭]

অতঃপর অতীশ ভগদত্তপুরের প্রথম ঘাটে এসে উপস্থিত হন।সেখানে গন্ধর্বদের অথর্বের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। অতীশের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তার পূর্ব জীবনের কথা। তার জন্মের ইতিহাস সে রোমন্থন করতে থাকেন। তিনি কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতীর মধ্যম পুত্র এবং পিতার নয়নের মনি ছিলেন। চন্দ্রগর্ভের মা ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন এবং পিতা বৌদ্ধ বংশীয়। ওদন্তপুরী থেকে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি যখন নদীবক্ষে ভেসে চলেছেন তখন পূর্বের অনেক কথাই তিনি ভাবছেন। তার মনে পড়ে গুরু জেতারির কথা যে কিনা অতীশের অহংকার চূর্ণ করেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই অতীশ গুরুর কাছে নিজেকে রাজপুত্র পরিচয় দেন। গুরু বলেন -

> "যে মহা বৈরাগ্যের পথ তুমি অবলম্বন করতে যাচ্ছ, সেখানে কোনোও রাজা নেই, নেই কোনও রাজপুত্র। দীনাতিদীন তুমি, যদি এই কথা নিজের সম্পর্কে না ভেবে অহংকার কর, তবে এই পথ তোমার জন্য নয়।"[৮]

আচার্য অবধূতি পা অতীশকে পিতার কাছে ফিরে যেতে বলেন। এই যাওয়াটা পরাজিতের যাওয়া নয়। গৃহে গিয়ে তিনি পিতা এবং মাতার আশীর্বাদ এবং অনুমতি নিয়ে পুনরায় আচার্য অবধূতি পার কাছে পৌঁছান। তখন গুরু অতীশকে তন্ত্র শিক্ষার জন্য কৃষ্ণ পর্বতে গুরু রাহুল গুপ্তের কাছে প্রেরণ করেন, আর সেই সূত্রেই অতীশ মগধে আসেন। গুরু রাহুল দ্বাদশ বছরের চন্দ্রগর্ভকে যাচাই করে নিতে চান। তিনি কি সত্যিই ভবিষ্যতে সাধক হতে পারবেন কিনা! আচার্য রাহুল তখন চন্দ্রগর্ভের সাথে চার জন পুরুষ ও চার জন নারীকে অতীশের সাথে দিয়ে তাঁর পিতার প্রাসাদে পাঠান। যারা অতি স্বল্প কাপড় পরিধান করছিলেন। একদিন ঈষিকা নামে এক মেয়ে চন্দ্রগর্ভের গোপন অঙ্গে হাত দেন এবং প্রকৃতির নিয়মে তিনিও কামার্ত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে গুরু জেতারির কথা তাঁর স্মরণে এলো -

> "যখন বুঝবে প্রকৃতি তোমাকে গ্রাস করছে তখন ঐ কুম্ভক ধরবে। মনে রেখো ইন্দ্র ধারণই সাধকের প্রেম সাধন।"[৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গুরু রাহুল বজ্র তার সংসার নাম চন্দ্রগর্ভ বদলে 'জ্ঞানগুহ্যবজ্র' দেন। তারপর তাঁর সাক্ষাৎ হয় উড্ডীয়ান প্রদেশের মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের লুইপার সাথে, আর লুইপাদ ও অতীশ মিলে রচনা করেন 'অভিসাম্যবিভঙ্গ' নামের গ্রন্থ। অতীশের মনে সামান্য অহংকার হল যে তিনি সব জেনে গেছেন। কিন্তু সেই অহংকার চূর্ণ হতে বেশিদিন সময় লাগেনি। স্বয়ং তারাদেবী সেই অহংকার চূর্ণ করেন। জ্ঞানগুহ্যবজ্র এর যখন উনত্রিশ বছর তখন তিনি নতুন জন্ম লাভ করেন। নালন্দাতে তিনি তিন বছর শিক্ষা লাভ করেন এবং ওদন্তপুরীতে তার নতুন নাম হয় 'অতীশ দীপঙ্কর'। অতীশ তারপর সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করেন। সেখানে রয়েছেন অদেখা গুরু আচার্য ধর্মকীর্তি। তারপর তার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে আচার্য ধর্মকীর্তির জীবন বৃত্তান্ত। ধর্ম কীর্তি 'অভিসামান্য- অলংকার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যা ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল। এক আশ্চর্য জ্ঞানপিপাসা নিয়ে অতীশ সুবর্ণ দ্বীপের পাড়ি দেন। পথে সামুদ্রিক ঝড়ে তারা পথ হারিয়ে অজানা এক দ্বীপে হারিয়ে যান। প্রায় দেড় বছর পর অতীশ সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছান। আচার্য ধর্মকীর্তি যোগ বলে অতীশ এর আগমন বার্তা আগেই পেয়েছিলেন। ধর্মকীর্তি অতীশকে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি উপহার দেন। আশীর্বাদ করে বলেন -

> "বৎস তুমি একদিন উত্তর দিকের তুষার দেশের মানুষেরও মনের রাজা হবে। তারা তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে।"[১০]

বারো বছর পর অতীশ সুবর্ণ দ্বীপ থেকে ফেরেন তখন তার বয়স তেতাল্লিশ। দেশে ফিরে তিনি প্রথমে জান গয়ার বজ্রাসন বিহারে, তারপর পূর্বজন্মের স্মৃতির টানে নালন্দা, ওদন্তপুরী বিহার থেকে রাজা নয়পালের অনুরোধে চলেছেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের পথে।

ক্রমে অতীশ বিক্রমশীল বিহারের দ্বারে উপস্থিত হন, এবং রাত হয়ে যাবার কারণে তিনি প্রথমদিন ধর্মশালাতেই কাটিয়ে দেন। রাজা ধর্মপাল প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে এই বিহার স্থাপন করেন। এই বিহারে মোট দুইশত তেষট্টিটি কক্ষ রয়েছে। বিহারে মোট একশো আটজন শিক্ষক ও চারজন আচার্য রয়েছেন। অতীশ ব্যগ্র হয়ে সমস্ত বিহার পরিদর্শন করেন। সমগ্র বিহার ঘুরে তিনি এক সময় নিজের কক্ষে আসেন এবং বিশ্রাম করেন। পরদিন অতীশ বিক্রমশীল বিহারের সকলের সাথে পরিচিত হন। বিহারের প্রধান অধ্যক্ষ সকলের সাথে অতীশকে পরিচয় করান এবং অতীশকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। অতীশ বিহারের সকলের জন্য একটানা অনেকক্ষন আলোচনা করেন। শেষে রত্নাকরের নির্দেশ পেয়ে সেই সভা শেষে হয়। পরদিন আহার শেষে অতীশের সাক্ষ্যৎ হয় মৈত্রীগুপ্তের সাথে। সে সংঘের ছাত্ররূপে এসেছে। তার সাংসারিক নাম ছিল শক্তিনাথ। মৈত্রীগুপ্ত তার নিজের ও পূর্বপুরুষের সম্পর্কে সমস্ত কথা অতীশের কাছে নিবেদন করলেন। অতীশ তাকে জিজ্ঞেস করে তার ভিক্ষু ধর্মের প্রবেশের ইচ্ছার মূলে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিই উদ্দেশ্য ছিল কিনা? উত্তরে সে বলেছে -

> "কদাপি নয়। সে একজন তন্ত্রাভিলাষি। বিদেহ তন্ত্রাচার্যের সংখ্যা বিপুল হলেও তাকে আকর্ষিত করে এই মহাবিহারে সিদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক প্রচারিত বৌদ্ধ তন্ত্রের দূরহ সাধন প্রক্রিয়া।"[১১]

সম্প্রতি বিহারে নতুন বসবাসকারী মৈত্রী গুপ্ত অতীশকে খুব ভাবাচ্ছে। প্রাক্তন জীবনে সে ছিল ব্রাহ্মণ। বিক্রম শীল বিহারের পাশের জনপদের অনেকেই ব্রাহ্মণ জাতির। তারা সকলেই মিথিলা থেকে এসেছেন এবং মিথিলা তন্ত্র শিক্ষার স্থান। বঙ্গের যাগ-যজ্ঞ ছাড়া ব্রাহ্মণরা মাথায় কাপড় বাঁধেন না, কিন্তু এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা মাথায় ক্ষত্রিয়ের মত পাগড়ি ধারণ করেন। কথা বলেন পাখির সুরে। মৈত্রী গুপ্ত অতীশের কাছে প্রহেলিকা-সম। যদি পূর্বজীবনে সে ব্রাহ্মণই হয় তবে কেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ছেড়ে কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করে মঠের জীবন শ্রেয় মনে করলো। তন্ত্র শিক্ষার জন্য? অতীশ ভাবলেন বিহারের ভবিষ্যৎ মৈত্রী গুপ্তের জন্য নষ্ট হতে তিনি দেবেন না। আরও জোরালো হয় অতীশের মৈত্রী তদন্ত। তারপর তিনি জানতে পারেন মৈত্রী গুপ্তের সংসার জীবনের নাম 'শুভরেশ্বর'। তার বিবাহিত স্ত্রী সংখ্যা সাত। এত সব ভাবনার মধ্যেও বিক্রমশীলা মহাবিহার সেজে উঠেছে আসন্ন বৌদ্ধ সমাগমের প্রস্তুতিতে। সে উপলক্ষে বিহারে আসছেন মহাশ্রমন নারোপা। গুরু নারোপার নির্দেশেই বিক্রমশিলা বিহার এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন সর্বত্যাগী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। একদিন চড় মারফত

এক সংবাদ পেয়ে অতীশ নিশীথ রাতে মাটির নিচে কক্ষে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেন মৈত্রী গুপ্ত এবং এক চন্ডালিনীকে। দুজনেরই অসংবৃত বেশ বাস। কাছেই পাওয়া গেল মৎসের ভোক্তা বিশিষ্ট ও সুরা। মেয়েটির অতীশের পায়ে লুটিয়ে পড়ে নেশার ঘোরে বলছে -

> "শভরেশ্বরের কোনও দোষ নেই। সে নাকি উচ্চকোটির সাধক। এই মদ্য সে এখনই দুগ্ধে পরিণত করবে। তারা তারাদেবীর সাধনা করছিল। অন্যত্রও তা হতে পারত। কিন্তু সমাজের শাসনেই আজ তাদের এই অবস্থা। ক্ষমা করুন হে মহাভিক্ষু! ক্ষমা করুন!"[১২]

অতীশ গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। নর-নারী এখনে শাসনের অবস্থায় নেই। পরদিন সকালে বিহারের ছাত্রদের মধ্যে এই খবর জানাজানি হবার আগে অতীশ, রত্নাকর এবং পাঁচ দ্বাররক্ষক সতর্কভাবে সেই গুপ্তকক্ষে গমন করেছেন, যেখানে মৈত্রী ও বসুমাতা বন্দি। অতীশ প্রশ্ন করলেন কিভাবে এই নারী ও মদ বিহারে প্রবেশ করল? মৈত্রী গুপ্ত রাগে ফুঁসছে। সে উত্তর দেয়-

> "আপনাদের অদীনপুন্যও, যিনি নাকি করুণার অবতার, নির্দোষ ও অসহায় দুটি মানব-মানবীকে এই ভাবে দন্ড দিতে উপদেশ করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ জানি কি বলবেন, আমি পাপি, কলঙ্কিত করেছি আপনাদের মঠ ও মঠবাসীদের। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্তিতে নয়। আজ শুনে রাখুন, নিছক তন্ত্র চর্চার অভিলাষে ও আমার সাধন সঙ্গিনীর সঙ্গে যুগ্ম-প্রয়াসে সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আসা। কিন্তু এসে কি দেখলাম, সংসার বিমুক্ত হয়েও আপনারা ঘোর সংসারী। সামাজিক সবরকম কুরুচিপূর্ণ কর্মের সন্ধান যথেষ্টই রাখেন।"[১৩]

এই কথা শুনে সন্ন্যাসীরা চলে যান। সমবেত বিচারে ঠিক হয় মৈত্রীকে বিহার থেকে নিষ্ক্রান্ত করা হবে, আর বসুমাতাকে গভীর রাতে ছেড়ে আসা হবে বিহারের বাইরে। গভীর রাতে বিক্রম শিলার প্রধান দার অবরুদ্ধ থাকে। তাই প্রাচীরের পাশের দ্বার দিয়ে তাকে বহিষ্কার করা হয়। যেতে যেতে মৈত্রী তার উদ্ধত দৃষ্টিপাতে শুধু অতীশকেই দগ্ধ করেনি তার দৃষ্টি বিহারের শেষ পর্যন্ত ছিল। হঠাৎ সেই কক্ষের সামনে মৈত্রী দাঁড়িয়ে যায়। যেখানে নতুন বিদ্যার্থীদের প্রশ্ন করা হয়। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

> "পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তির নাম কি?
> মৈত্রী-লোচনা, মামকী, তারা, পান্ডরা, আর্যতারিকা।
> বোধিসত্ত্ব কয়জন? এবং তাদের মধ্যে প্রধান কে?
> মৈত্রী- পাঁচ। তাঁদের মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বর প্রধান।"[১৪]

মৈত্রীকে বিহার থেকে বহিষ্কার করে অতীশের দিন কাটে আত্ম-মন্থনে। তিনি কি অবিচার করলেন? মানুষরূপে শভরকে না দেখে তার বিচার করলেন? একদিন রাতে অতীশের স্বপ্নে তারাদেবী আসেন। তিনি অতীশকে বলেন-

> "বৎস তুমি শভরের প্রতি অন্যায় করেছ। শভর আমার আশ্রিত। বোধী জীবনের প্রথম স্তরে, তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারোনি পুত্র। এ তোমারই অক্ষমতা। মহাযানে উপাধ্যায় কে 'কল্যাণ মিত্র' আখ্যা কেন দেওয়া হয়েছিল? তার অর্থ গুরু-শিষ্য মতভেদ আদর্শগত প্রভেদ থাকলেও সংঘে অধিকার দুজনেরই সমান থাকত এবং উভয়েই পরস্পরের মিত্র হতেন।"[১৫]

অতীশ নিদ্রা ভঙ্গ করে ভাবেন তারা দেবীর স্বপ্নাদর্শনের কথা। এই অপরাধের জন্য অতীশকে সুমেরুর এক মহাপক্ষী রূপে জন্ম নিতে হবে। এরপর তারাদেবী অতীশকে আদেশ দেন মহাযান ধর্ম প্রচারের জন্য উত্তরগামী পথে তিব্বতে যেতে হবে পাপ মুক্তির জন্য।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 236 - 243
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেখতে দেখতে বিক্রমশিলা বিহারে অতীশের পনেরো বছর কেটে যায়। বিহারের বিষয় নিয়ে ভাবনার মধ্যেও হঠাৎ মনে উঁকি দিত তারাদেবীর নির্দেশ। একদিন নাগতাশো অতীশের কাছে আসেন। তিনি এসেছেন বৌদ্ধ রাজা এ-শে-ওদ এর কথায়। তিনি অতীশকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চান। সেই দূত বলে -

> "হে জ্ঞানপ্রভ মহান অতীশ যদিও আমার মাতৃভূমি ইতিপূর্বেই ধন্য হয়েছে আচার্য শান্তরক্ষিত মহাবিভূতি পদ্ম সম্ভারের পাদস্পর্শে। তবুও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে। আমার স্বদেশ তিব্বত এখন অধার্মিকতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেখানকার বিপন্ন মানুষকে একমাত্র আপনিই পারেন উদ্ধার করতে। দয়া করুন, হে বুদ্ধজ্যোতি স্বরূপ, দয়া করুন।"[১৬]

তারপর তিব্বতের লামার দল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সাথে বিক্রমশীল বিহারে আসেন, অতীশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্য। অতীশ বিক্রমশিলা বিহারের সকলের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তিব্বত যাত্রা নিশ্চিত করেন। এটিই তার জীবনের শেষ যাত্রা। আজ অতীশ আটান্ন বছর বয়সী। এই বিহারে আসেন তেতাল্লিশ বছর বয়সে। তারপর অতীশ এর কাছে বার্তা আসে বজ্রাসন গুহায় এক ভিখারিনী কে তার কিছু কড়ি দেবার কথা ছিল। অতীশ বজ্রাসন গুহায় যান। সেখানে সেই ভিখারিনীর কথায় বুঝতে পারেন এই যাত্রা যে সে যাত্রা নয়। এ যাত্রা জীবন বৈতরণী পার হয়ে চিরদিনের মতো যাওয়া। বিক্রমশিলাকে বিদায় দিয়ে অতীশ এগিয়ে যান মহাপ্রস্থানের দিকে, মহাস্থবির অদীনপুণ্যকে স্মরণ করে। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইল ১০৪০ খৃষ্টীয় শতক।

আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক এভাবেই বাস্তবধর্মী পথে মহাস্থবির অতীশ দীপঙ্করের নালন্দা বিহার থেকে বিক্রমশিলা বিহারে গমনের বর্ণনা এবং সেখানে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও সেখান থেকে সুদূর তিব্বতে মহাপ্রস্থানের ঘটনাকে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন। যা হয়ে উঠেছে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস এবং এই উপন্যাস রচনার পেছনে ঔপন্যাসিকের যে মূল দুটি কারণ ছিল তা তিনি অনেকাংশেই বর্ণনা করতে পেরেছেন। উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মহান অতীশ দীপঙ্করের মহানির্বাণের যাত্রা পথের অপূর্ব গাঁথা।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, ২৫শে বৈশাখ ১৪০২, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৮৬
২. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, আগস্ট ১৯৯৫, 'সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ২৩১
৩. তদেব পৃ. ২৩১
৪. তদেব পৃ. ২৩১
৫. বাগচী, শর্মিলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, অনন্তপুণ্য অতীশ দীপঙ্কর, কলকাতা, গাঙচিল পৃ. ২১
৬. তদেব পৃ. ৩০
৭. তদেব পৃ. ৪০
৮. তদেব পৃ. ৫০
৯. তদেব পৃ. ৫৭
১০. তদেব পৃ. ৬৪
১১. তদেব পৃ. ৯০
১২. তদেব পৃ. ১১২
১৩. তদেব পৃ. ১১৩
১৪. তদেব পৃ. ১১৫
১৫. তদেব পৃ. ১১৬
১৬. তদেব পৃ. ১২২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বাগচী, শর্মিলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, অনন্তপুণ্য অতীশ দীপঙ্কর, কলকাতা, গাঙচিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, ২৫শে বৈশাখ ১৪০২, সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, আগস্ট ১৯৯৫, ‘সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড।